Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual- Peer Reviewed-Bi-Annual
Digital Research Journal
Website : santiniketansahityapath.org.in
ISSN 2583-6706 (Online)
Volume-3 Issue-1 July 2024

‘সর্পরহস্য সুন্দরবনে’ যমজ ভাই

রাইসা রহমান

Link : https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2024/07/11_Raisha-Rahaman.pdf

সারসংক্ষেপ: যমজ দুই ভাইকে নিয়ে সুচিত্রা ভট্টাচার্যের লেখা উপন্যাস ‘সর্প-রহস্য সুন্দরবনে’। যমজদের একজন বিজ্ঞানী এবং দেশপ্রেমিক। অন্যজন অপরাধী এবং অর্থলোলুপ। অর্থলোভী ভাইয়ের লোভের সামনে পড়ে বিজ্ঞানী ভাইয়ের প্রাণসংশয় কীভাবে হয়েছিল, সেটাই সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাস অবলম্বনে আলোচনা করা হয়েছে।

সূচক শব্দ: মিতিনমাসি, টুপুর, সুমন্ত্র, সুধন্য, অনিশ্চয় মজুমদার, সত্যজিৎ রায়

সাহিত্যে যমজ চরিত্রের উদাহরণ নতুন কিছু নয়। বিংশ শতাব্দীর অন্যতম বাংলা সাহিত্যিক তথা গোয়েন্দা সাহিত্যের রচয়িতা সুচিত্রা ভট্টাচার্য তাঁর ‘সর্প-রহস্য সুন্দরবনে’ উপন্যাসে দুই যমজ ভাইয়ের চরিত্র অঙ্কন করেছেন সুমন্ত্র সান্যাল ও সুধন্য সান্যাল নামক দুই যমজ ভাইকে অবলম্বন করে। তাঁর অগ্রজ সাহিত্যিক এবং বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের বিশিষ্ট লেখক সত্যজিৎ রায়ও তাঁর গোয়েন্দা উপন্যাস ‘ফেলুদা সমগ্র’র অন্তর্গত ‘কৈলাস চৌধুরীর পাথর’ অংশে যমজ চরিত্র অঙ্কন করেছেন কৈলাস চৌধুরী ও কেদার চৌধুরীকে নিয়ে। লক্ষণীয় বিষয় হলো, উভয় ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকদ্বয়ের উদ্দেশ্য প্রায় অভিন্ন। যে-কোনো যমজ সন্তানের মধ্যে যেমন তাদের যমজ বৈশিষ্ট্য প্রতিবিম্বিত হয়, তেমনি প্রতিটি চরিত্রের নিজস্ব বিপরীত বৈশিষ্ট্যও প্রতিফলিত হয়। সুচিত্রা ভট্টাচার্য দুই যমজ ভাইয়ের সম ও বিপরীত — উভয় বৈশিষ্ট্যকে এক সফল মনস্তাত্ত্বিকের মতো বিশ্লেষণ করেছেন।

সত্যজিৎ রায় এবং সুচিত্রা ভট্টাচার্য উভয়ে যমজ সন্তানের বৈশিষ্ট্যের দিকগুলি বিবেচনা করে তাঁদের উপন্যাসের কাহিনি নির্মাণ করেছেন। ‘সর্প-রহস্য সুন্দরবনে’ উপন্যাসে সুচিত্রা ভট্টাচার্য সুমন্ত্র ও সুধন্যর মধ্যে ‘মিল’ যেমন দেখিয়েছেন, তেমনি তাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যাবলিকেও সুনিপুণভাবে অঙ্কন করেছেন — একজন বিজ্ঞানী সুমন্ত্র সান্যাল। অপরজন সুধন্য সান্যাল বোহেমিয়ান যদিও শারীরিক গঠনগত মিলের কারণে একজনের থেকে অপরজনকে আলাদা করে চিনে নেওয়ায় বেগ পেতে হয়। ঠিক এই কারণেই সুচিত্রা ভট্টাচার্য টুপুর নামক এক তরুণীর চোখ দিয়ে দুই ভাইকে দেখেছিলেন এবং উভয়ের শারীরিক গঠনগত মিল উপেক্ষা করে তাদের ব্যক্তিত্বের কাঙ্ক্ষিত অমিলের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন:

“টুপুর একদৃষ্টে ডক্টর সান্যালকে দেখছিল। বিখ্যাত বিজ্ঞানী বলতে যে প্রাজ্ঞ প্রাজ্ঞ ছবি চোখে ভাসে, সুমন্ত্র যেন ঠিক সেই গোত্রের নন। বয়স তো বেশ কম, পঁয়তাল্লিশও হবে কিনা সন্দেহ। রোগা, লম্বা দেহযষ্ঠির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নাসিকাটিও বেখাপ্পা রকমের খাড়া। অনেকটা ধনেশপাখির ঠোঁটের মতো। ব্যাকব্রাশ চুল, চোখে মেটাল ফ্রেমের চশমা, চোয়াড়ে গাল নিখুঁত কামানো। গাত্রবর্ণ ঈষৎ তামাটে। তবে চোখের মণি দুটো কিন্তু দারুণ উজ্জ্বল। এত কালো মণি খুব কমই দেখা যায়।”

উপন্যাসের অগ্রগতির সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করি যে, সুমন্ত্র সান্যাল তাঁর বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে একজন সৎ, দেশপ্রাণ নিবেদিত বিজ্ঞানী হয়ে উঠেছেন; অপরদিকে সুধন্য সান্যালও তাঁর বিপরীত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে চতুর অপরাধীতে পরিণত হয়েছেন। দেখা গেছে, যমজ চরিত্রগুলির মধ্যে কোনো একজনের রাগ ও বিরক্তি প্রকাশক লক্ষণগুলি প্রবল হয়ে থাকে। এই জন্যই সুধন্য সান্যালের বোহেমিয়ান চরিত্রটি চতুর অপরাধী হয়ে উঠেছে। দুই যমজ ভাইয়ের শারীরিক সাদৃশ্যের প্রসঙ্গে প্রথমে আসা যাক। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের আলোচ্য ‘সর্পরহস্য সুন্দরবনে’ উপন্যাসের যে পটভূমি রচিত হয়েছে, তাতে দুই যমজ ভাইয়ের কাহিনি বর্ণিত হলেও এই কাহিনিতে দুই ভাইয়ের মধ্যে যে ঘটনা লেখক দেখিয়েছেন তা একপ্রকার প্রায় সম্ভব হতো না

যদি না উপন্যাসের মূল চরিত্র সর্প গবেষক সুমন্ত্র সান্যালের সঙ্গে তাঁর যমজ ভাইয়ের চেহারার এবং কণ্ঠস্বরের হুবহু মিল লক্ষ্য করা যেত। যমজ দুই ভাইয়ের চেহারার হুবহু সাদৃশ্য মিতিনের কথায় পরিষ্কার হয়ে যায় —

“মিতিন বলল, ‘আহা, বেচারাদের আর উপায়ই বা কী ছিল! রজারকে না সরালে সুমন্ত্রবাবুর জায়গায় সুধন্যবাবু ঢুকবেন কী করে! দু’জনে যমজ ভাই ঠিকই, দেখতেও হুবহু এক। তবে মানুষ ধোঁকা খেতে পারে, কুকুর তো আসল লোক চিনতে এক সেকেন্ডও সময় নেবে না।’

টুপুর বলল, ‘সত্যি, যমজ ভাইদের চেহারায় এত মিল আমি জন্মে দেখিনি।’

‘হয় রে, হয়। অনেক হয়। হয়তো একটু ডিফারেন্স থাকে। হয়তো হাইটে হাফ ইঞ্চি কম-বেশি, কিংবা ভুরু অন্যরকম। অথবা নাকে স্লাইট তফাত। পাশাপাশি দু’জনকে একসঙ্গে না দেখলে ওটুকু ধরাই যাবে না।’

‘আমাদের মধ্যেও আছে।’ সুমন্ত্র বললেন, ‘চোখের মণিতে।’

‘জানি। আপনার মণি কালো। আর আপনার ভাইয়ের চোখ কটা। সুধন্যবাবু কনট্যাক্ট লেন্স পরে সেটা সহজেই ম্যানেজ করেছিলেন।’

‘পার্থ ভুরু কুঁচকোল, ‘তুমি আই-বলের ব্যাপারটা জানলে কী করে?’

‘দেবেশ সেনের কল্যাণে। দেবেশবাবুর মুখে গল্প শুনে হঠাৎই রাতে মাথায় স্ট্রাইক করল, দু’ভাই বোধহয় যমজ। নইলে একজন যখন বিএসসি ফাইনাল ইয়ারে, অন্যজনের তখন মেডিক্যাল থার্ড ইয়ার? রাতে ফোন লাগাতেই রহস্য জলবৎ তরলং। চোখের কালারের ডিফারেন্সটাও জেনে গেলাম।’

‘আর-একটা চিহ্নও ছিল আমাদের চেনার।” সুমন্ত্র চোখ বুজলেন, “আমার কাঁধে জড়ুল আছে, সোনার নেই।’

২

এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ৪৫ বছর বয়সী সুমন্ত্র সান্যাল পেশায় বায়োসায়েন্টিস্ট (জীববিজ্ঞানী)। তিনি বর্তমানে সাপের বিষ থেকে ক্যান্সারের ঔষধ আবিষ্কারের মতো মহৎ কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। এই ধরনের জনহিতকর গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য এবং দেশের প্রতি গভীর ভালোবাসার টানে তিনি সুদূর আমেরিকার বিলাসবহুল ও সুবিধাজনক জীবনযাপনের যাবতীয় মোহ ত্যাগ করে এবং সেখানকার বাসিন্দা নিজের পরিবারের মায়া কাটিয়ে শুধুমাত্র গবেষণা কর্মের সুযোগ সুবিধাকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বাসন্তীর মতো একটি কোলাহল বর্জিত শান্ত দ্বীপের সর্পসংকুল ম্যানগ্রোভ অঞ্চলকে বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর গবেষণার মূল উপাদান বিভিন্ন প্রজাতির সর্প। তাই সর্পের সুপ্রতুল সরবরাহের উপযুক্ত স্থান হিসাবে তিনি বাসন্তী দ্বীপকেই বেছে নেন এবং সেখানেই আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁর কাজই ছিল বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ক্যান্সারের প্রতিষেধক হিসেবে সাপের বিষকে ব্যবহারের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা। সুমন্ত্রের ছদ্মবেশধারী সুধন্যের সঙ্গে কথোপকথনকালে বিজ্ঞানী সুমন্ত্র সান্যালের এই মহৎ উদ্দেশ্যকে লেখিকা পাঠকের কাছে উপস্থাপন করেছেন —

— আপনার কাজটা তো ক্যান্সারের ওষুধ নিয়ে, তাই না?

— হুম।

— আপনি তো সাপের বিষ থেকেই...। ব্যাপারটা আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে। যদি একটু বুঝিয়ে বলেন...

— ক্যান্সার রোগটা সম্পর্কে আপনার কোনও পরিষ্কার ধারণা আছে কী?

— অল্পস্বল্প। যত দূর জানি, কারও কারও শরীরে নাকি, কোনও বিশেষ কারণে, কখনও কখনও শরীরের কোনও একটা কোষের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটায়। মানে...

— পর্শিয়ালি ঠিক বললেন। তবে কারও কারও নয়, আমাদের প্রত্যেকের দেহেই থাকে প্রটো-অংকোজিন। সেই প্রটো-অংকোজিন যখন প্রো-অ্যাকটিভ অংকোজিনে পরিণত হয়, তখনই ক্যান্সারের আশঙ্কা দেখা দেয়। আমি চাইছি ওই প্রসেসটাকেই আটকাতে। অর্থাৎ আমার ওষুধ হবে ক্যান্সারের প্রতিষেধক। কলেরা বা বসন্তের টিকার মতো।

— অসাধারণ! পার্থর স্বরে তারিফ, ‘তার মানে ক্যান্সারের চান্সটাই আপনি নির্মূল করে দেবেন?’

— চেষ্টা করছি। প্রিভেনশন ইজ অলওয়েজ বেটার দ্যান কিয়োর।

— বটেই তো! মিতিনের চোখেও মুগ্ধতা, 'কিন্তু স্যার, সাপের বিষ থেকে সত্যিই কি তা বের করা সম্ভব?'

— কেন নয়? সুমন্ত্র হাসলেন, 'সাপের বিষ আদতে কী? একগাদা এনজাইম, আর খুব ঘন প্রোটিনের মিক্সচার। আমার কাজের ডিটেলে না গিয়েও আমি বলতে পারি, কোনও কোনও এনজাইম সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করতে পারলে প্রটো-অংকোজিনকে নষ্ট করে দেওয়া সম্ভব। অন্তত তার অংকোজিন হওয়ার প্রবণতাটাকে তো বিনষ্ট করা যায়ই। পদ্ধতিটা খুবই জটিল, তবে কিন্তু একেবারে অসম্ভব নয়। কী, বোঝাতে পারলাম?'

— কিছুটা তো আইডিয়া হলই। কী মজুমদারসাহেব, হল না?

প্রসঙ্গাত উল্লেখ্য, সত্যজিৎ রায়ের কেদার চরিত্রটি সুচিত্রা ভট্টাচার্যের সুধন্য চরিত্রের মতো তাঁর যমজ ভাই কৈলাসের (সুমন্ত্র সান্যালের অনুরূপ চরিত্র) সঙ্গে আপন দৈহিক সাদৃশ্যকে ব্যবহার করে তার দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করতে চেয়েছিলেন:

"দড়ির বাঁধন খুলে দিয়ে তাঁকে কোলপাঁজা করে নিয়ে ফেলুদা সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় নেমে কৈলাসবাবুর ঘরে নিয়ে বিছানার উপর শোয়াল। ভদ্রলোক তখন ফেলুদার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে ক্ষীণ গলায় বললেন, 'আপনিই কি... ?' ফেলুদা বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমারই নাম প্রদোষ মিত্তির। চিঠিটা বোধহয় আপনিই আমাকে লিখেছিলেন — কিন্তু আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হবার সৌভাগ্য হয়নি।... অবনীশবাবু, এঁর জন্য একটু গরম দুধের ব্যবস্থা দেখুন তো।' আমি অবাক হয়ে ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে আছি। ইনিই তাহলে কৈলাস চৌধুরী! ভদ্রলোক বালিশের উপর ভর দিয়ে খানিকটা সোজা হয়ে বসে বললেন, 'শরীরের জোর ছিল, তাই টিকে আছি। অন্য কেউ হলে... এই চার দিনে... !'

ফেলুদা বলল, 'আপনি বেশি স্ট্রেন করবেন না।'

কৈলাসবাবু বললেন, কিছু কথা তো বলতেই হবে — নইলে ব্যাপারটা আপনার কাছে পরিষ্কার হবে না। আপনার সাথে আর সাক্ষাৎ হবে কী করে — যেদিন চিঠি দিলুম আপনাকে, সেইদিনই তো ও আমাকে বন্দি করে ফেলল। তাও চায়ের সঙ্গে ওষুধ মিশিয়ে অজ্ঞান করে — নইলে গায়ের জোরে পারত না।'

'আর সেদিন থেকেই উনি কৈলাস চৌধুরী সেজে বসেছিলেন?'

কৈলাসবাবু দুঃখের ভাব করে মাথা নেড়ে বললেন, 'দোষটা আমারই, জানেন। বানিয়ে বানিয়ে বড়াই করাটা বোধহয় আমাদের রক্তে একেবারে মিশে আছে। পঞ্চাশ টাকা দিয়ে একটা পাথর কিনেছিলুম জব্বলপুরের বাজার থেকে। কী দুর্মতি হল, ফিরে এসে চাঁদার জঙ্গালের এক দেবমন্দিরের গল্প ফেঁদে কেদারকে তাক লাগিয়ে দিলুম। সেই থেকেই ওর ওইটের উপর লোভ। আমার ভাগ্যটা ও সহ্য করতে পারেনি। বোধহয় ভাবত — দুজনে যমজ ভাই — চোখে দেখে কোনও তফাত করা যায় না, অথচ আমার গুণ, আমার রোজগার, আমার ভাগ্য — এ ব্যাপারে ওর সঙ্গে এত তফাত হবে কেন? ও নিজে ছিল বেপরোয়া ব্রেকলেস। একবার তো নোট জাল করার কেসে পড়েছিল। আমিই কোনও রকমে ওকে বাঁচাই। বিলেত গেল আমারই কাছ থেকে টাকা ধার করে। ভাবলুম আপদ গেল। এই সাতদিন আগে — গত মঙ্গলবার — বাড়ি ফিরে দেখি পাথরটা নেই। তার কথা মনেই হয়নি। চাকরদের উপর চোটপাট করলুম — কোনও ফল হলো না। বিষ্যুদবার সকালে আপনাকে চিঠি দিলাম। সেদিনই রাত্রে ও এল। বাজারে যাচাই করে জেনেছে ও পাথরের কোনও দাম নেই, অথচ ও দেখেছিল লাখ টাকার স্বপ্ন। ক্ষেপে একেবারে লাল। টাকার দরকার — অন্তত বিশ হাজার! চাইল — রিফিউজ করলুম। তাতে ও আমাকে অজ্ঞান করে বন্দি করল। বলল যতদিন না টাকা দিই তদ্দিন ছাড়বে না — আর সে ক'দিন ও কৈলাস চৌধুরী সেজে বসে থাকবে — কেবল আদালতে যাবে না — অসুখ বলে ছুটি নেবে।'

ফেলুদা বলল, 'আমি যখন আপনার চিঠি পেয়ে এসে পড়লাম, তখন ভদ্রলোক একটু মুশকিলে পড়েছিলেন, তাই আমায় দশ মিনিট বসিয়ে রেখে একটা হুমকি চিঠি, আর একজন কাল্পনিক শত্রু খাড়া করলেন। এইটে না করলে আমাদের সন্দেহ হত। অথচ আমি থাকলেও বিপদ — তাই আবার টেলিফোনে হুমকি দিয়ে আর গাড়ি চাপা দিয়ে আমাদের হটাতেও চেষ্টা করলেন!'

'সর্পরহস্য সুন্দরবনে' উপন্যাসে সুমন্ত্র সান্যালের এহেন জনহিতকর কাজে তাঁর সর্বক্ষণের সহযোগী নীলাম্বর বিশ্বাস নামে বছর তিরিশের তরুণ। এই নীলাম্বর বিভিন্ন প্রজাতির আর নানান রঙবেরঙের বিষধর সাপের পরিচর্যা এবং দেখাশোনা করে। আর

বিজ্ঞানীকে গবেষণার কাজে সাহায্য করে থাকে। বিজ্ঞানীর ঘর সংসারের যাবতীয় কাজের দায়িত্বভারও তার উপর ন্যস্ত।

একদিকে সুমন্ত্র একজন নামজাদা বিজ্ঞানী, দেশপ্রেমিক, জনগণের কল্যাণ সাধনই যাঁর ধ্যানজ্ঞান। সেই সুমন্ত্ররই যমজ ভাই সুধন্য আবার অন্যদিকে সম্পূর্ণ বিপরীত মানসিকতা ও ভাবনার মানুষ —

"অনিশ্চয় বললেন, 'আপনাদের মধ্যে আরও অনেক তফাত আছে ডক্টর সান্যাল। আপনাদের দু'জনের ক্যারেক্টারটাই একদম আলাদা। আপনি সৎ, বিদ্বান, দেশপ্রেমিক। আর আপনার ভাই লোভী, শঠ, নেশাখোর। আপনার উপর তার টানও নেই। নইলে লোভে পড়ে আপনার সঙ্গে এই ভয়ংকর নিষ্ঠুর আচরণ করে!' "

সহোদর দুজন ভাইয়ের সম্পূর্ণ বিপরীত মানসিকতা ও কাজকর্মে একজনের দ্বারা যেমন জনগণ তথা সমাজের অতীব কল্যাণ হতে পারে, অন্যজনের দ্বারা তেমনি বৃহত্তর অকল্যাণও হতে পারে। আলোচ্য উপন্যাসে সুমন্ত্র হয়ে উঠেছেন মানুষের জন্য কল্যাণের প্রতীক, পক্ষান্তরে সুধন্য হয়ে উঠেছেন অকল্যাণ, ক্ষতি ও বিপর্যয়ের প্রতীক। সুমন্ত্র তাঁর আন্তরিক চাওয়া পাওয়াকে দেশকল্যাণে রূপ দিতে চেয়েছেন। তাই তিনি নিজেকে উজাড় করে অত্যন্ত নিষ্ঠা এবং মনোযোগের সহিত গবেষণার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। অপরদিকে, সুধন্য চেয়েছেন আপন ভাইয়ের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁরই আবিষ্কৃত ঔষধের পেটেন্ট কোনো কোম্পানির কাছে বিক্রি করে মোটা অঙ্কের মুনাফা লাভ করতে। আত্মস্বার্থমগ্ন সুধন্য দেশের এবং দশের কল্যাণের চেয়ে অগ্রাধিকার দিয়েছেন নিজের সংকীর্ণ স্বার্থ ও মুনাফাকে —

> 'কী স্পর্ধা ভাবুন, সে আমাকে বলে কিনা, 'ফর্মুলাটা দিয়ে দে! বড় কোনও ওষুধ কোম্পানিতে মোটা টাকায় বেচে তুই আমি দু'জনেই কোটিপতি বনে যাই!' আমি রাজি হইনি বলেই ওর এই চণ্ডমূর্তি।'
>
> 'তা স্যার, আপনার কাছে মাসদুয়েক আগে যে তিনটে লোক এসেছিল, তারা কারা?'
>
> 'তারাই তো ওরা। সোনার তিন শাগরেদ। তখন এসে পরিচয় দিয়েছিল ওষুধ কোম্পানির অফিসার বলে। প্রথমে মিষ্টি কথায় লোভ দেখাল, তারপর সরাসরি শাসানি।' সুমন্ত্র যেন সামান্য উত্তেজিত, 'পরে বুঝলাম, সোনাই ওদের সাজিয়েগুছিয়ে পাঠিয়েছিল।'

আপন স্বার্থ চরিতার্থ করতে না পেরে প্রয়োজনে সুধন্য তাঁর সহোদর ভাইকে অপহরণ করার মতো ঘৃণ্য কাজ করে নিচু মানসিকতার পরিচয় দিতেও পিছুপা হননি। এই অতীব নিন্দনীয় অপরাধ করেও সামান্যতম অনুতপ্ত হওয়া তো দূরের কথা, তাঁর নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের পথের সম্ভাব্য সকল বাধা দূর করতে তিনি বদ্ধ পরিকর হয়ে ওঠেন। সুমন্ত্র সান্যালের অতিপ্রিয় পোষ্য ডোবারম্যান প্রজাতির কুকুর রজার এবং বিজ্ঞানী সুমন্ত্রের ডানহাত নীলাম্বর উভয়কে তিনি হত্যা করেন, যা সুমন্ত্রবাবু পরবর্তীকালে বর্ণনা করেছেন — 'হ্যাঁ। আমার রজারকে ওরাই মেরেছিল।' ইজিচেয়ারে অর্ধশায়িত সুমন্ত্রর ক্ষীণ স্বর শোনা গেল, 'মল্লিকপুরে আমাকে ওরা ভয় দেখিয়ে বলত, রিভলভারে সাইলেন্সার লাগিয়ে মেরে রজারকে যেমন জলে ভাসিয়ে দিয়েছি, আপনাকেও সেভাবে...।'

এমনকি সুধন্যর সংলাপ থেকেই আমরা মানুষকে হত্যা করার মতো জঘন্য এক রূঢ় মানসিকতা এবং নীলাম্বরকে খুন করার স্বীকারোক্তিও খুঁজে পাই —

"শয়তান মেয়ে টিকটিকিটাকে ধাক্কা দিয়ে ট্রেনের তলায় ফেলে দিসনি কেন! দাঁড়া, আজকের ঝামেলা মিটুক, ডিটেকটিভকেও আমি নীলাম্বর আর ডোবারম্যানটার কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করছি! আসছি আমি। যত তাড়াতাড়ি পারি পৌঁছচ্ছি!"

সুধন্যর অন্যায় দাবী অস্বীকার করলে তিনি প্রথমে রজারকে হত্যা করেন, তারপরে তিনি সুমন্ত্র সান্যালকে অপহরণ করে নিজের বাড়িতে বন্দী করেন। এরপর নিজেই সুমন্ত্র সান্যাল সেজে বাসন্তীতে সুমন্ত্ররই বাসস্থানে বিজ্ঞানীর ছদ্মবেশে আপন অসৎ উদ্দেশ্য সাধনে মেতে ওঠেন। লক্ষণীয় বিষয় হলো, প্রভুভক্ত 'কুকুর' পাছে তার নকলপ্রভু সুধন্যকে চিনে না ফেলে সেজন্য সুধন্য প্রথমেই সুমন্ত্রের কুকুর রজারকে পৃথিবীর বুক থেকে সরিয়ে দেন এবং পরে নীলাম্বরের প্রাণ নাশ করেন।

৩

সুচিত্রা ভট্টাচার্য তাঁর উপন্যাসটির এমন জটিল প্লট নির্মাণ করেছেন পেঁয়াজের খোসার মতো প্রতিটি রহস্য উন্মোচনের জন্য যাতে এক মুহূর্তের জন্যও পাঠক কাহিনি থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়। তাঁর বছর ত্রিশের নারী গোয়েন্দা মিতিনমাসি এই গভীর অথচ জটিল রহস্য উন্মোচন করে সত্যে উপনীত হয়ে একজন সুদক্ষ গোয়েন্দার পরিচয় দিয়েছেন। মিতিনমাসি ওরফে প্রজ্ঞা পারমিতা মুখার্জী তাঁর পর্যাপ্ত পড়াশোনা, প্রখর বুদ্ধি, যুক্তিশীল মনন এবং গোয়েন্দাসুলভ উপযুক্ত ব্যক্তিত্বকে কাজে লাগিয়ে, নিজের প্রাণ সংশয়ের কোনোরকম তোয়াক্কা না করেই সুকৌশলে যেভাবে অপরাধীকে খুঁজে বার করেছেন এবং পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করেছেন, তা সত্যিই বিশেষ প্রশংসনীয়। এই কাজে তিনি যেভাবে আগ্নেয়াস্ত্রকে কাজে লাগিয়েছেন এবং ক্যারাটের প্রশিক্ষণকে ব্যবহার করে আত্মরক্ষা করেছেন তা তাঁর উপস্থিত বুদ্ধির পরিচায়ক:

“মিতিন ধীরেসুস্থে ভ্যানিটি ব্যাগের চেন খুলল। এবং তারপরই যে বস্তুটি বের করল, তার জন্য লোকটা কণামাত্র প্রস্তুত ছিল না। টুপুরও নয়।

আস্ত একখানা রিভলভার!

সেকেন্ডের মধ্যে সেফটি ক্যাচ খুলে মিতিন রিভলভারের নল ঢুকিয়ে দিয়েছে লোকটার নাকের ফুটোয়। তীক্ষ্ণ স্বরে হিসহিসিয়ে উঠল, ‘এক চুল নড়লে গুলি চালিয়ে দেব।’

আতঙ্কে চোখ প্রায় ঠিকরে বেরিয়ে এল লোকটার। ঘড়ঘড় করছে গলা। ঘামছে দরদর।

রিভলভার দিয়েই লোকটাকে ঠেলল মিতিন, ‘চলুন, ভিতরে চলুন। উঁহু, ঘোরার চেষ্টা নয়। পিছন দিকেই হাঁটুন।’

অগোছালো বসার ঘরের মাঝখানে এসে মিতিন পলকে চোখ বুলিয়ে নিল চারদিকে। জিজ্ঞেস করল, ‘টেলিফোন কোথায়?’

কাঁপতে কাঁপতে লোকটা বলল, ‘দো-দো -দো-দোতলায়।’

‘টুপুর, আমার ব্যাগ থেকে মোবাইলটা বের কর তো।’

মিতিন মাসির দাপট দেখে টুপুরের বুকেও বল এসে গিয়েছে সহসা। দ্রুত খুদে যন্ত্রখানা তুলে নিয়ে এগিয়ে দিয়েছে। ওই এগিয়ে দেওয়া আর মিতিনের ঝলক ঘুরে তাকানো — দুইয়ের মধ্যে যেটুকু সময়, তার ফাঁকেই এই লোকটা ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে মিতিনকে। হিংস্র বুনো ভল্লুকের মতো হাঁ হাঁ করে ধেয়ে এলো সঙ্গে সঙ্গে। পরমুহূর্তেই যা ঘটল, টুপুর জীবনেও ভুলবে না। কাঁধের ওড়না ফেলে দিয়ে ভল্ট খেয়ে উঠে দাঁড়াল মিতিনমাসি। বিদ্যুৎবেগে সরে গেল খানিকটা। তারপর বিকট চিৎকার হেনে জোর এক লাফ। এবং লোকটার বুকে সপাটে জোড়া পায়ের লাথি। কী সাংঘাতিক জোর ওই পদাঘাতের, বাপস! কাটা কলাগাছের মতো লোকটা ধরাশায়ী!

তড়িত গতিতে লোকটার বুকে হাঁটু চেপে মিতিনের রিভলভার এবার লোকটার রগে, ‘কী, ট্রিগার টিপবো?’

লোকটা অসহায়ভাবে মাথা ঝাঁকাল, ‘আমি কিছু জানি না। আমায় ছেড়ে দিন।’

‘কোনও চালাকি নয়। উঠে বসুন। ফোনে বাসন্তীতে কথা বলুন এখনই। আপনার বসের সঙ্গে।’

‘কে কে কে... কে বস?’

‘ন্যাকা সাজা হচ্ছে? যা যা বলছি, অবিকল সেই কথাগুলো বলবেন। একটা শব্দ এদিক-ওদিক হলে কিন্তু নীলাম্বরের চেয়েও বিচ্ছিরিভাবে মরতে হবে। আমি কিন্তু ঘিলু ছেতরে দেব।’

‘কী... কী... কী... কী...বলবো’?’ লোকটা কাঁপছে।

‘বলছি। মন দিয়ে শুনুন।... বলবেন, হাওয়া খুব গরম। মেয়ে টিকটিকিটা সব আঁচ করে ফেলেছে। মাল আর এখানে রাখা সম্ভব নয়, আজই পাচার করা দরকার। আপনি যে করে হোক এখনই চলে আসুন। আমি আর-একবার বাইকে চেপে বাইরের হাওয়া দেখে আসছি। তেমন বুঝলে আপনাকে আবার ফোন করবো।

‘অ্যা অ্যা অ্যা অ্যাতো কথা...?’

'হ্যাঁ। গলা যেন একটুও না কাঁপে। বলতে পারলে নীলাম্বর হত্যায় রাজসাক্ষী হওয়ার সুযোগ মিলতে পারে। না পারলে আজই জীবনের ইতি।' বলেই মিতিন ঘুরেছে টুপুরের দিকে, 'মোবাইলে সুমন্ত্র সান্যালের নম্বরটা ধর তো। প্রথমে বাসন্তীর এসটিডি কোড। জিরো থ্রি টু ওয়ান এইট থ্রি টু ...'

একজন আদর্শ গোয়েন্দার সব ধরনের ইতিবাচক দিকগুলি তাঁর মধ্যে বিদ্যমান থাকায় তিনি এই জটিল রহস্যমোড়া অপরাধের গোড়ায় পৌঁছাতে পেরেছেন:

"টুপুর মনে মনে হাসছিল। মিতিনমাসির স্বভাবটাই এরকম। কখনওই নিজেকে জাহির করতে চায় না। সে তো দেখেছে, কীভাবে মিতিনমাসি কুংফুর দক্ষতায় অবলীলায় পটকে দিল লোকটাকে। থাক, সে কাহিনি, শুনে ওসি সাহেব হয়তো ভিরমি খাবেন!"

এখানে মিতিন মাসি একজন নারী হয়েও কোনো পুরুষ গোয়েন্দার থেকে যে কোনো অংশে কম নন তা সপ্রমাণ করেছেন। আর এইভাবেই সুচিত্রা ভট্টচার্যের ফেমিনিস্ট মানসিকতার প্রতিচ্ছবি মিতিন মাসির মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে।

সুমন্ত্র সান্যালের মতো একজন সৎ ও নিষ্ঠাবান বিজ্ঞানীর জীবন তথা তাঁর বৃহৎ কর্মযজ্ঞের এক্সপেরিমেন্টকে রক্ষা করে এবং সর্বোপরি এমন বড়ো ধরনের ক্ষতির হাত থেকে দেশকে রক্ষা করে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন মিতিনমাসি। আর এই বিশেষ কাজে তাঁকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন তাঁর জামাইবাবু অবনী। এছাড়াও তাঁর স্বামী পার্থ, সহযোগী বোনঝি টুপুর ওরফে ঐন্দ্রিলা এবং পুলিশের বড়োকর্তা অনিশ্চয় মজুমদারও তাঁকে সাহায্য করেছেন। মিতিনের কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য উপস্থাপন করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদঘাটনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন এই পুলিশ কর্তাটি। সুমন্ত্র সান্যালের অতীত সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য হাজির করার জন্য সুলুক সন্ধান এনে দিতে অবনী তাঁর ক্লাসমেট দেবেশকে মিতিনমাসির কাছে নিয়ে আসেন। এই দেবেশের দেওয়া তথ্য থেকেই মিতিন সুমন্ত্রর যমজ ভাই সুধন্যর সন্ধান পেয়েছেন, যা এই অপরাধের সূত্র সন্ধানে অতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এছাড়াও এই দুই ভাইয়ের মধ্যে চেহারাগত সাদৃশ্য থাকলেও তাঁরা মানসিকতা, আচার-আচরণ, রুচি ও চিন্তা চেতনায় যে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছিলেন সেই তথ্যও মিতিন মাসি এই দেবেশের কাছ থেকে উদ্ধার করেছেন:

'সুমন্ত্র ছিল একটু আত্মকেন্দ্রিক। নিজেকে নিয়ে, নিজের পড়াশোনা নিয়ে থাকতেই বেশি ভালবাসতো। তবে খারাপ ছেলেও নয়। কথাবার্তায় খুবই ভদ্র, সভ্য। প্লিজিং এই পার্সোনালিটি। মেধার দিক দিয়ে মাঝামাঝি। তবে অসম্ভব স্টুডিয়াস আর সিস্টেমেটিক। ব্রিলিয়ান্ট ছিল ওর ভাইটা। জয়েন্টে হাই রাঙ্ক করে মেডিক্যালে অ্যাডমিশন পেয়েছিল। কিন্তু কী বলব, পরে অসৎ সঙ্গে পড়ে একেবারে বখে গিয়েছিল ছেলেটা। কলেজ পড়ার সময় এক-দুবার গিয়েছি সুমন্ত্রদের মল্লিকপুরের বাড়িতে। তখনও ছেলেটা মেডিক্যাল কন্টিনিউ করছে। কিন্তু তখনই দিনরাত ড্রাগে চুর হয়ে থাকত। সুমন্ত্র ছিল তুলনায় অনেক ব্যালান্সড। ফ্যামিলির অবস্থা ভালো নয় বলে প্রাণ দিয়ে খাটত। বিএসসি-তে হাই ফার্স্ট ক্লাস পেল সুমন্ত্র, আর ভাইটি থার্ড ইয়ারেই লেখাপড়া জলাঞ্জলি দিয়ে কি এক ইংরেজি গানের ট্রুপ খুলে বসল। কী যেন নাম ছিল ভাইটার?... হ্যাঁ হ্যাঁ, সুধন্য। এমন নেশার কবলে পড়েছিল যে, নিজের বাড়ির ঘটিবাটি বেচে দিত। চুরির কেসে বোধ হয় ধরাও পড়েছে বারকয়েক। এমএসসি পড়ার সময় দেখেছি, ভাইকে নিয়ে সুমন্ত্র ভারী ওয়ারিড থাকত।'

'কিন্তু তিনি তো শুনলাম এখন বাঙ্গালোরে চাকরি করছে!'

'তাই নাকি? আমি যেন অন্যরকম শুনেছিলাম। কী এক মেডিক্যাল ফার্মে কাজ পেয়েছে, ওষুধটষুধ বেচছে।... তা বাইরে গিয়ে সেটেল্ড হয়ে থাকলে তো আরও ভাল। সুধন্য বিয়েথা করেছে?'

এই সূত্র ধরেই সুধন্যর মল্লিকপুরের বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন মিতিন। সঙ্গে ছিল তাঁর সহকারি গোয়েন্দা বোনঝি টুপুর। সেখানে গিয়েই এই তথ্যগুলির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা মিতিনের যে সন্দেহ সত্যিতে পরিণত হয়েছিল, তা পাঠক বিলক্ষণ বুঝেছেন।

যে-কোনো দক্ষ গোয়েন্দার কাজ হলো — কোনো ঘটনার মিসিং লিংকগুলিকে আবিষ্কার করা। বর্তমান উপন্যাসে গোয়েন্দা মিতিনমাসি এই কাজটি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে করেছেন যেমনভাবে 'সারান্ডায় শয়তান' উপন্যাসে চোরাশিকারিরি দলের চারজন সদস্যের মধ্যে যোগসূত্র কীভাবে স্থাপিত হয়েছে তার মিসিং লিঙ্ক মিতিনমাসি খুঁজে পেয়েছিলেন। থলকোবাদের ইন্সপেকশন বাংলোতে ফেলে যাওয়া 'বটল-ওপেনার' দেখে মিতিনমাসি বহুদিন পূর্বে কেনিয়ার জেল থেকে পলাতক গর্জন রায়কে চিহ্নিত করেছিলেন,

‘বরং বটল-ওপেনারটাকেই ক্লু হিসেবে ধরা যায়।... মিতিন ঘাড় নাড়ল, বটল-ওপেনারটার গায়ে লেখা ছিল এলিফ্যান্ট ফেস্টিভ্যাল, নাইনটিন নাইনটিটু, কিনিয়া। ওটা দেখেই মনে পড়ে গেল কিনিয়ায় হস্তি-উৎসবের পরপরই কিনিয়ার নাকুরুতে গর্জন রায় নামের লোকটা ধরা পড়েছিল। কাগজে মোটামুটি ডিটেলেই বেরিয়েছিল খবরটা। যতদূর মনে আছে, হেডিং ছিল গজদন্ত পাচারের দায়ে বিদেশে ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার গ্রেফতার। মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে ছবিটা ও চোখের সামনে ভেসে উঠল। আরে, সেই লোকই তো এই লোক! হাতি মারতে সারান্ডায় হানা দিয়েছে আন্তর্জাতিক ক্রিমিনাল গর্জন রায়! তাও গর্জন রায়ের বর্তমান খবরাখবর জানার জন্য মেঘাতুবুরু গিয়ে ফোন করলাম অনিশ্চয়বাবুকে। উনি আমার কাছে ঘণ্টাখানেক সময় চেয়ে নিলেন। তারপর ইন্টারনেট আর পুলিশ ফাইল ঘেঁটে কনফার্ম করলেন বছর দেড়েক আগে কিনিয়ার জেল ভেঙে পালিয়েছে গর্জন রায়। অতএব সে ভারতে চলে আসতেই পারে। তোমাদের হয়তো মনে আছে, গত বছর নর্থ বেঙ্গলে দুটো হাতিকে মেরে গজদন্ত লুঠ করা হয়েছিল। সম্ভবত ভারতে গর্জন রায়ের ওটাই প্রথম কীর্তি।’

আর এখানেই সুচিত্রা ভট্টাচার্য যে উদ্দেশ্য নিয়ে নারী-গোয়েন্দা মিতিনমাসি চরিত্রটি নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন, যা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি, তা সম্পূর্ণ রূপে সফল। একই সঙ্গে দুজন যমজ ভাইয়ের বিপ্রতীপ মনস্তত্ত্বকে লেখিকা তাঁর সুনিপুণ দক্ষতায় চিত্রিত করেছেন। সম্ভবত এমন মনস্তাত্ত্বিক বিচার একমাত্র সত্যজিৎ রায় ছাড়া বাংলা সাহিত্যে সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাস ছাড়া অন্য কোথাও বিরল।

তথ্যঋণ:

১। ‘মিতিনমাসি সমগ্র ১’, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, অষ্টম মুদ্রণ মার্চ ২০২০

লেখক পরিচিতি: রাইসা রহমান, এম.ফিল গবেষিকা, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, পশ্চিমবঙ্গ